সারসংক্ষেপ (Abstract)

আদিম যুগ থেকে আজও মানুষের সঙ্গে মাছের সম্পর্ক শুধু দর্শন স্পর্শন ও ভক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানব জাতির মাছ শিকার বা মাছ ধরার ইতিহাস সুপ্রাচীন। আদিম প্রস্তর যুগ থেকেই মানুষ মাছকে খাদ্য হিসাবে যে ব্যবহার করত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ম্যাগলেমোশিয়ান সভ্যতার নিদর্শন থেকে জানা যায় মেগালিথিক যুগে (খ্রি.পূ. ১০০০০-৬০০০) মানুষের মাছ ধরার কৌশল জানা ছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শুরু করে মাছচাষ। আনুমানিক ২৫০০ খ্রি.পূ. মিশর ও রোমে যে মাছচাষের প্রচলন ছিল তা জানা যায়।

‘মালো’ একটি প্রাচীন আর্যেতর জাতি। ‘মহাভারত’ বলে ধীবর সম্প্রদায়ের দাস রাজার কন্যা সত্যবতী-পুত্র ‘দ্বৈপায়ন ব্যাস’ মহাভারতের কৌরব-পাণ্ডবকুলের পিতা। এ সত্য অপ্রিয় হলেও সর্বজনজ্ঞাত। মালোরাও দাবি করেন ‘রাজ রক্ত’ তাদের শরীরে। বর্তমানে পিছিয়ে পড়া জাতি হিসাবে চিহ্নিত হলেও ইতিহাস বলে- মালো সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল।

রিসলে মালোদের আদিম অধিবাসী হিসেবে ধরেছেন। একথা দাবি করা হয় যে, তারা আসলে রাজপুতানার মল্লগড়ের ঝালো। যার ফলাফল হল তারা ক্ষত্রিয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় মহাভারতে মল্লদের ‘বাহুযোধিনঃ’ এবং ঝালোদের লকু(অ)যোধিনঃ বলা হয়েছে। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে মাল্ল এবং মালোর মধ্যে পার্থক্য আছে।

জলের প্রধান উৎস সমুদ্র এবং সুলভ উৎস নদী। নদী একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা এবং জীবনব্যবস্থায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলার অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নদীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বাঙালির সমাজমনস্তত্ত্বে নদীর প্রভাব অনস্বীকার্য। নদী বাঙালির জীবনধারা ও সমাজপ্রবাহকে বৈচিত্র্যময় করেছে। বাঙালির জীবনে নদীর ভূমিকা প্রায়শ ইতিবাচক কিন্তু কখনো কখনো নেতিবাচকও বটে।

বাংলা সাহিত্যে নদীভিত্তিক বা নদীকেন্দ্রিক অথবা নদীর দ্বারা প্রভাবিত উপন্যাসের সংখ্যা নেহাত কম নয়। কল্লোল-পরবর্তী সার্থক এবং বহুল আলোচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে নদীপ্রধান উপন্যাসের সংখ্যা বেশ উৎসাহজনক। এসব উপন্যাসের কোনো কোনোটিতে নদী নিয়ামক শক্তিরূপে দেখা দিয়েছে, কোথাও নদী হয়েছে পটভূমি। বাংলার অধিকাংশ খ্যাতিমান

কথাসাহিত্যিক নদীকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখেছেন। কারো কারো রচনায় নদী শুধু পটভূমি হয়ে থাকেনি, এক একটা চরিত্র হয়ে উঠেছে। মানুষের মতোই তারা বহুমাত্রিক আচরণ করেছে, ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেছে, কাহিনির মোড় ঘুরিয়েছে এবং পরিণতি রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

ভারত বিভাগের পূর্ব থেকেই নদী ও নদীতীরবর্তী মানুষজনকে নিয়ে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয় বাংলা ভাষায়। বিভাগোত্তর পর্বেও নদীসংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ও তার জীবনযাপন পদ্ধতি নিয়ে উপন্যাস রচনা অব্যাহত থাকে। এই ধরনের উপন্যাসের সংখ্যা স্বল্প, কিন্তু মণ্ডনকলায় ও জীবনবাস্তবতায় উজ্জ্বল।

ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েম হওয়ার পর বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়। ইংরেজি শিক্ষা এবং সেই সূত্রে আগত পাশ্চাত্য চিন্তাধারা প্রচলিত অনেক মূল্যবোধের প্রতি সংশয়ের জন্ম দেয়। মানুষ, সমাজ ও তার ধারা হয় অস্থির, আন্দোলিত।

মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে বাংলা গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচার, দেশীয় সাময়িক পত্রের প্রকাশ, ইংরেজদের নিজেদের স্বার্থে এদেশীয় ভাষার প্রতি আগ্রহ, কোনো কোনো বিশিষ্ট ইংরেজের বাংলাভাষার প্রতি সপ্রশংস মনোভাব, মিশনারিদের বাংলাভাষা সম্বন্ধে আগ্রহ ইত্যাদি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে মাতৃভাষার অনুকূল করে তুলল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ অস্থির এবং নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল। বাঙালি যেন এই পর্বে জীবনকে পুনর্গঠন করতে প্রয়াসী। এ পর্ব বাঙালির আত্মরক্ষার এবং আত্মআবিষ্কারের পর্ব। ধর্ম ও সমাজজীবনের ভাঙাগড়ায় অস্থির এই পরিবর্তমান পর্ব আক্ষরিক অর্থেই সাহিত্যসৃষ্টির পর্ব নয়। অন্যদিকে, বাঙালি তার মধ্যযুগীয় নির্বিকারত্ব এইসময় কিছুটা কাটিয়ে ওঠে। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীর হাঙ্গামার, পলাশীর যুদ্ধের বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিফলন সমকালীন বাংলাসাহিত্যে প্রায় না থাকলেও, উনিশ শতকে নবজিজ্ঞাসার সূচনায় ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচিত্র ঘটনাবলী সমকালীন বাংলা সাহিত্যে যে ছাপ রাখল, তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের উপন্যাস সাহিত্য। জীবনের রূপ বর্ণনা করতে গেলে তার পটভূমি প্রয়োজন। এই পটভূমির প্রধান উপাদান মানুষ ও সমাজ। উপন্যাসের স্বরূপ-সন্ধানের ক্ষেত্রেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবান।

মানবসভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই আচার-অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব বিদ্যমান। আচার-অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে প্রাচীন কিংবা আধুনিক মানবসভ্যতার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আচার-অনুষ্ঠান আমাদের সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির বলিষ্ঠ প্রকাশ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে। তাই কোনো সম্প্রদায়ের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গেলে তাদের আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ ধারণা থাকা দরকার। সমস্ত পেশার মানুষ কিছু আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে। চাষবাস, জীবজন্তু শিকার, মাছ ধরা ইত্যাদি পেশার সঙ্গে আচার অনুষ্ঠান অঙ্গাঙ্গী বা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যে-পেশায় অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকি যত বেশি, সেই পেশায় নিয়মনিষ্ঠার প্রাধান্য তত বেশি। সমুদ্রে বা নদীতে মাছ শিকারের অনিশ্চয়তা এবং জীবনের ঝুঁকি দুইই আছে। ফলে জেলেদের মধ্যে সংস্কার মেনে চলার প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে বেশি।

‘বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ’ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে চর্যাপদ থেকে বর্তমান ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত মালোদের জীবন ও প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা গ্রন্থগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করে বাংলা সাহিত্যে মালো জাতির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি এবং বাংলা সাহিত্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মালো জাতির প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে সেটা অনুসন্ধান করা হয়েছে। বাংলা সংস্কৃতিতে মালো জাতির প্রসঙ্গ কোন কোন দিকে বিশ্লেষিত হয়েছে তাও তুলে ধরা হয়েছে। ‘বাংলা সাহিত্যে মালো জাতি ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ’ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিম্নলিখিত পাঁচটি অধ্যায়ে সজ্জিত করা হয়েছে-

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : **মালো জাতির উৎস ও বিকাশ**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **মালোদের সমাজজীবন**

তৃতীয় অধ্যায় : **সাহিত্যে মালো জাতির প্রসঙ্গ**

চতুর্থ অধ্যায় : **সংস্কৃতিতে মালো জাতির প্রসঙ্গ**

পঞ্চম অধ্যায় : **মালো জাতি ও বিশ্বায়ন**

উপসংহার

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে মালো জাতি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে ভূমিকায়। এর পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে মালো জাতির প্রসঙ্গ কোথায় এবং কীভাবে এসেছে এবং মালো জাতি সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণাগার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখাও তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সবশেষে এই গবেষণাকর্মটিতে অনুসৃত গবেষণা-পদ্ধতি (Research-Method) সম্পর্কে উল্লেখ করে 'ভূমিকা' সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সভ্যতার আদিলগ্নে মানুষ কীভাবে নদীতীরে বসতি গড়ে তুলল, বাঙালি জাতির উদ্ভব কীভাবে হল, আর্যজাতি বাংলায় প্রবেশের পর কীভাবে আর্যজাতি আর অনার্যজাতির সংমিশ্রণ ঘটল, মিশ্রবর্ণ বা বর্ণসংকরের শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদি এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এই অধ্যায়ে কৈবর্ত, মালো, মৎস্যজীবী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। ঝালো মালো জাতি রাজপুতানার ক্ষত্রিয় জাতি। তারা স্থানান্তরিত হয়ে বাংলার নদীতীরে বসতি স্থাপন করে এবং মাছ ধরা এবং চাষের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। মালোরা উত্তর পশ্চিম ভারতের আর্যবংশোদ্ভব দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি। মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্মণ তার 'ঝাল-মাল তত্ত্ব' গ্রন্থটিতে জাতি বা বর্ণ, বর্ণ ও বর্ণসংকর, মালোরা বর্ণসংকর নহে, ব্রাত্য নিন্দনীয় নহে, বর্ণ, বৃত্তি ও উপাধি এই পাঁচটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে ঝালো মালো কে ক্ষত্রিয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মালোদের বর্ণসংকর মানতে রাজি নন। তিনি নানা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মালোরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। এই অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাজব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তার পরিচয় পাওয়া যায়। নদী যেমন লালন করে তেমনি আবার তার রুদ্ররোষে মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে যায়, জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়। সেই বিপর্যস্ত জেলে জীবনের ছবি এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। নদী এবং সমুদ্রের পাড়ে অবস্থিত জেলেজীবনের পরিচয় রয়েছে এই অধ্যায়ে। মালোদের বৃত্তিজীবন, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, মহাজনী শোষণের কথা, উচ্চবর্গীয় ও নিম্নবর্গীয়দের দ্বন্দ্বের কথা, বৃত্তিবদলের কথা, প্রধান জীবিকার পাশাপাশি উপজীবিকা, শ্রেণিবৈষম্য, বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার, মালোদের রাজনীতি, প্রতিবাদস্পৃহা, আত্মসচেতনতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। জেলেদের শিক্ষাবিরূপ মনোভাবের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তার পাশাপাশি শিক্ষিত জেলেসমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে মালোদের তাদের জীবিকাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে যা তাদের সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করেছে যা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রান্তবর্গীয়দের অন্যতম উল্লেখ্য জনগোষ্ঠী হল মালো বা জেলে। চর্যাপদ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনীগ্রন্থ নির্বাচন করা হয়েছে। গ্রন্থগুলিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করে বাংলা সাহিত্যে মালো জাতির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি এবং বাংলা সাহিত্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মালো জাতির প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে সেটা অনুসন্ধান করা হয়েছে। পাঁচটি উপ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মাছ, মালো, মল্লযুদ্ধ, মল্লবীরদের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ (খ্রিস্টীয় ১৪শ-১৫শ শতাব্দী), 'পদ্মাপুরাণ' (১৪৯৪ খ্রি.), চণ্ডীমঙ্গল (১৫৪৪ খ্রি.), কাশীদাসী মহাভারত (১৬০৪ খ্রি.), শিবায়ন (১৭১১ খ্রি.), ধর্মমঙ্গল (১৭১১খ্রি.), অন্নদামঙ্গলে (১৭৫২ খ্রি.) কীভাবে এদের প্রসঙ্গ এসেছে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মালোরা মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করত তার পরিচয় পাওয়া যায়। মালোদের নিয়ে বাংলায় যে উপন্যাসগুলো লেখা হয়েছে সেগুলি হল- 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), 'গঙ্গা' (১৯৫৭), 'গহিন গাঙ' (১৯৮০), 'মৎস্যগন্ধা' (১৯৮৭), 'মুক্তামাছ' (১৯৯৫), 'ইলিশ জোড়' (১৯৯৭), 'জল ও জালের তরঙ্গ' (২০১৪), 'জাল থেকে জালে' (২০১৫) 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১), 'মিঠেজল : রুপোলী ইলিশ' (১৩৭১), 'শামদ্দি জেলে এবং সমুদ্র' (১৩৭১), 'সৌদামিনী মালো' (২০০৯), 'কালোনৌকা (১৯৯৭), 'গোত্রান্তর' (ভাসমান ২০০০), 'প্রতিবাদ' (ভাসমান ২০০২), 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা' (২০০৩), 'চোর' (১৪১৫), 'বস্ত্রহরণ' (২০১২) । এই উপন্যাস এবং গল্পগুলোতে মালোদের জীবনযাত্রা, জীবনসংগ্রামের ছবি ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাস এবং গল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। মালো জাতিকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন কবিতা যেমন জসীম উদ্‌দীন এর 'রাখালী' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়', পরিতোষ বিশ্বাসের 'ঠিকানার খোঁজে' (১৪০৯) কাব্যগ্রন্থের 'একটি নদীর সাথে দেখা', বিধান রায়ের 'অমাবস্যায় জ্যোৎস্নার আল্পনা' (২০০৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সনাতন মাঝি', লিলি হালদারের 'গহীন জলে মৎস্যকন্যা' (২০১২) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'চলেছি দূর সাগরে' 'স্বপ্ন', 'প্রকৃতির খেলা', 'মেঘের আলোর উৎসব' ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। উৎপল দত্ত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। 'মালো পাড়ার মা' (১৯৮৩) উৎপল দত্তের রচিত আরেকটি নাটক। নাটকটি মালদহের রতুয়া থানার হত্যাকাণ্ড অবলম্বনে রচিত। এই নাটকদুটি আলোচিত হয়েছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং তার 'তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাস' নিয়ে অনেক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। সুকুমার বর্মনের 'রুদিজলার মানুষ' (১৯৯৭), লক্ষ্মণ কুমার হালদারের 'গঙ্গার ইলিশ ও নদনদীর ইতিকথা' (ভাসমান ২০০২), পরিতোষ বিশ্বাসের 'খুলনার মৎস্যজীবীদের সন্ধানে' (ভাসমান ২০০৩), ঝর্ণা বর্মণ তার 'চেম্মিন ও তিতাস' (ভাসমান ২০০৬), দিগেন বর্মণ রচিত 'সালতামামি মাছ ও মৎস্যজীবীদের কথা' (২০১৭) প্রবন্ধে মালোদের জীবনের

নানা সমস্যার দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। বেবী হালদার নিজেও একজন মালো। মেধা পাটেকর তাকে বলেছেন 'মেহনতী সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী। তার জীবনসংগ্রামের কথা উঠে এসেছে তার লেখা আত্মজীবনী 'আলো আধাঁরি'তে। শৈশবেই মাকে হারিয়েছিলেন, ১৩ বছর বয়সে বিয়ের পর ঘরছাড়া। থাকতে পারেননি নিপীড়ক স্বামীর সংসারেও। তারপর বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে ট্রেনে চেপে রাজধানীতে চলে যান। নয়াদিল্লিতে গৃহকর্মীর কাজ দিয়ে জীবনের শুরু করেছিলেন দুর্গাপুরের মেয়ে বেবী হালদার, আজ তিনি পৌঁছে গিয়েছেন জগতসভায়, নিজের গল্প বলতে। শুধু মুখের কথায় নয়, লেখনী দিয়ে। বেবী হালদারের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, জাপানি প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 'আলো আঁধারি'-র পরবর্তী গ্রন্থ হল- 'ঈষৎ রূপান্তর' (২০০৮)। ২০০২-তে 'আলো আঁধারি' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বেবীর যে আত্মপ্রকাশের যাত্রা শুরু হয়েছিল, ২০১৪-তে এসে তা ঘরে ফেরার পথ এর মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায়। শ্রীযুক্ত বিপদভঞ্জন সরকার মহাশয় তার জীবনীগ্রন্থ 'জলঙ্গির পদ্মা' (২০২১) রচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে এই গ্রন্থগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি, ক্ষেত্রসমীক্ষা বলতে কী বোঝায় সেই সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, কেন দক্ষিণ দিনাজপুর নামকরণ হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়কে দুটি উপ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা সংস্কৃতি ও মালো সংস্কৃতির সংমিশ্রণ কীভাবে ঘটেছে তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বোলান, ভগবতী পূজা, গোপালের আরতি বা গান, হোলির গান, শীতলা মার গান, নাম গান বা আগমনী গান, লক্ষ্মীর গান, মনসা, চড়ক ইত্যাদি এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মালোদের লোকসংস্কৃতি উপ অধ্যায়ে গম্ভীরা, নৌকা বাইচের গান, ত্রিনাথের গান, সোনা রায়ের গান, নাউবরন্যা বা নাউভাসানী, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বারোমাসি গান ইত্যাদি লোকসংগীত বিভিন্ন ধরনের লোকনৃত্য, লোকসংস্কার, মাকাল ব্রত, নাটাইব্রত, ক্ষেত্রব্রত ইত্যাদি ব্রত, বিভিন্ন ধরনের লোকউৎসব, লোকদেবতা যেমন মাকাল, দক্ষিণরায়, মঙ্গলা, সান্ঝা, সোনা রায়, নৌকা বরণ, ডালা পুজো, ত্রিনাথের পুজো, গলুই পুজো, গঙ্গা পুজো, মালোদের ব্যবহৃত মন্ত্র, হেঁয়ালি, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রভৃতি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। তার পাশাপাশি উপন্যাস থেকেও সংস্কৃতির অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্বায়ন কী, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থা, গণমাধ্যমে বিশ্বায়নের প্রভাব, বিশ্বায়নের সুফল কুফল কীভাবে

মৎস্যজীবীদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে যেমন মাছের উৎপাদন বাড়ছে, মুনাফা বাড়ছে তেমনি পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। জাতিগতভাবে যারা মালো নয় তারাও বর্তমানে এই পেশায় অংশ নিচ্ছে। আবার মালোদের এই পেশা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে। এই অধ্যায়ে এই সব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

সবশেষে প্রতিটি অধ্যায়ে আলোচনার মূল সিদ্ধান্তগুলিকে উপসংহারে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই গবেষণা করতে গিয়ে এই বিষয় সংলগ্ন পরবর্তী গবেষণার সূত্র-নির্দেশ করা হয়েছে এখানে।

এছাড়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানচিত্র, ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মালোদের ব্যবহৃত জাল, নৌকা, তাদের ঘরবাড়ি, গঙ্গাপুজো, হ্যাচারি, মালোদের পত্রিকা ভাসমান এর প্রচ্ছদ, সূচিপত্র ইত্যাদির চিত্রাদি 'পরিশিষ্ট-ক' অংশে সংযোজন করা হয়েছে। 'পরিশিষ্ট-খ' অংশে মৎস্য বিভাগের ২০১৬-২০১৭ সালের মৎস্য পরিসংখ্যানের হাতের বই থেকে সংগৃহীত মৎস্য ও মৎস্যজীবী সংক্রান্ত তথ্য যেমন মৎস্য পরিসংখ্যান, মৎস্য সম্পদের অভ্যন্তরীণ খাত, সামুদ্রিক খাত, জেলা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধ জলের এলাকা, পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ নদীর দৈর্ঘ্য, ২০১৭-২০১৮, ২০২০-২০২১ সালের জেলা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ প্রস্তাবিত লক্ষ্য ও সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ব্লক অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ জলক্ষেত্র, বছর অনুযায়ী মাছের চাহিদা ও উৎপাদন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হ্যাচারির সংখ্যা, মৎস্যজীবীদের জাতি অনুযায়ী জনসংখ্যা এবং ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মোট, গ্রামীণ এবং শহুরে জনসংখ্যার তালিকা সংযুক্ত হয়েছে। এরপরে 'গ্রন্থপঞ্জি' এবং 'নির্ঘণ্ট' সংযোজন করে অভিসন্দর্ভটি সমাপন করা হয়েছে।